নানান কথা

রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

হেথা আমি কি গাহিব গান—
যেথা গভীর ওঁ কারে, সাম ঝঙ্কারে
যাপিত দূর বিমান—সেথা আমি কি গাহিব গান।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা পরিলক্ষিত হয় অন্তর্দেশ ও বহির্দেশ—অনেকটা ঐ ইনট্রোভার্ট ও একসট্রোভার্ট, শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই মধ্যে যা পাই। দুর্ভাগ্যের কথা শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও অনুগামীবৃন্দ তাঁর বৈপ্লবিক দিকটা পরিহার করে ভক্তিবাদী বা ভাববাদী দিকটাই গ্রহণ করলেন, ফলে এক সময় তা ন্যাড়া নেড়ী বা বোষ্টম বোষ্টমীর দলে পরিণত হয়। যা সৌভাগ্যক্রমে বিবেকানন্দর মতো শিষ্য থাকার বা পাওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণর বিপ্লববাদী ও ভাববাদী দুটি দিকই আমরা পাই। তাছাড়া তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন বা পত্তন করেননি। যার জন্য মিশন থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ নামধারী সব প্রতিষ্ঠানই শিব জ্ঞানে জীব সেবাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা নিমপীঠ, আদ্যাপীঠ, বারাকপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম করতে পারি। শ্রীচৈতন্যর জীবদ্দশাতেই বৈষ্ণবদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বিশেষ সম্প্রদায় না থাকায় রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি। আজ সারা পৃথিবীতে ১৯২টির বেশি রামকৃষ্ণপন্থী প্রতিষ্ঠান আছে। পরাশিক্ষা ও জনসেবা ব্রততেই সম্পৃক্ত।

শ্রীঅরবিন্দ লাহোর সম্মেলন থেকে ফেরার পর বলেছিলেন—"যেদিন দেখলাম এক নিরক্ষরপ্রায় ব্রাহ্মণ এসে দক্ষিণেশ্বরে বসেছেন, সেদিনই জানি ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আর বিলম্ব নেই। আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালক ঐ নিরক্ষরপ্রায় ব্রাহ্মণ"।

চৈতন্য ভক্তরা তার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করার জন্য তাঁর দ্বারা বহু অন্যায় ও অপ্রাকৃত কার্যের কথা লিখেছেন যার একটি মায়ের মাথায় পদক্ষেপণ, যা তাঁর মতো মাতৃভক্তর পক্ষে অসম্ভব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বৃন্দাবনে যেতে চান কিন্তু মাতৃআজ্ঞায় সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে পুরীকেই কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন।

দক্ষ পটুয়ার মতো রামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বিবেকানন্দকে তৈরি করেন যেভাবে গুরু তৈরি করেছিলেন শিবাজীকে। গুরু গোবিন্দ ধর্মের সঙ্গে শৌর্য বীর্যকে যোগ করায় তাঁর অনুগামীরা হয়েছিলেন অমিত বীর্যশালী এক জাতি—যা মূলত একটিমাত্র প্রদেশে সীমাবদ্ধ থেকেও আজ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। গীতায় ভগবান তাই বলেছেন—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ। স্বামীজির যা পথের ছিল পাথেয়। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'Sri Chaitannya was a great revolutionary." তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সামান্য কিছু হয়তো হয়েছে কিন্তু তা সংখ্যায় খুবই কম। আলোচনা যা হয়েছে তা তাঁর অধ্যাত্মবাদ নিয়েই। অবশ্য আজ রামকৃষ্ণ ভক্ত/সমিতি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকেন।

আমরা দেখি বিপ্লবী বাঘা যতীনের গুরু হিসাবে বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে। কর্মসন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দর গুরু ছিলেন ভাস্করানন্দ স্বামী। এঁরা স্বীয় শিষ্যকে ধর্মতত্ত্ব ও স্বদেশ ব্রত তত্ত্ব উভয় শিক্ষা দেন বলে জানা যায়। সেক্ষেত্রে আমরা ৫০০ বৎসর ধরে শ্রীচৈতন্য জীবনের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর মতের অবমূল্যায়ন করেছি। রামকৃষ্ণদেব বলছেন—"নরেন ইংরেজরা আমাদের দেশে সর্বনাশ করেছে।" আরেক জায়গায় বলছেন—"দ্বেষ নয়, দেশ—" "দেশের কথা ভাব" দেশ হুড়হুড়িয়ে এগিয়ে যাবে।" মা ইংরেজদের সম্বন্ধে বলছেন—"ওরা কবে যাবে বলতে পারিস?"

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী গ্রন্থে তাঁর মরা বাঁচানো বা রোগ সারানো জাতীয় ঘটনা ঘটানোর কথা পড়া যায় না—সিদ্ধাই বা ঐ জাতীয় ব্যাপার তিনি করতেন না। একবার মথুরবাবুর ফোড়া হয়, খুব কষ্ট পেয়ে বারবার উপশমের জন্য ঠাকুরকে ডাকছেন, ঠাকুর গেলেন না। বললেন "ওসব সারাবার ক্ষমতা আমার নেই।" অলৌকিক ঘটনা যদি কিছু ঘটে থাকে তা হয় স্বাভাবিকভাবে বা কাকতালীয় ভাবে। যা অধ্যাত্ম পুরুষদের জীবনীতে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যে বেদান্ত এতাবৎ কাল গুহাভ্যন্তরে আবদ্ধ ছিল। বিবেকানন্দ তাকে রূপ দিলেন Working Bedantaতে। জাগতিক দিক থেকে ঠাকুর দূরে থাকেননি। একজনের ২টি সন্তান হয়েছে শুনে বললেন—"এ বার তোরা বাপু ভাইবোনের মতো থাক।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হয়নি। সন্তান উৎপাদনও সাধারণ কামবৃত্তি ছিল না। পূজাপাঠ করে, দিনক্ষণ দেখে করা হত।

বহুক্ষেত্রে জাগতিক বিষয়ে শ্রীচৈতন্যও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এমনকি রাজনীতি ও যুদ্ধ বিষয়েও। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর কাছে গৌড় আক্রমণ বিষয়ে পরামর্শ চাইছেন এও তাঁর জীবনী গ্রন্থে দেখা যায়। আসলে প্রকৃত সাধক এসব বিষয়ে নিস্পৃহ থাকতে পারেন না। বিশেষ জন্মভূমি বা মানবিকতা সম্বন্ধে। মার মৃত্যুর পর তাঁকে কাঁদতে দেখে এক ভক্ত বলল "ঠাকুর আপনিও কাঁদছেন?"—ঠাকুর উত্তর করলেন, কাঁদব না রে শালা, ঐ দেহ থেকে এই দেহ।"

মূলত অধ্যাত্মবাদী হলেও তিনি জাগতিক সুখ-দুঃখ সমস্যাকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। যার মধ্যে বহুবার, বহু ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সুপ্ত সিংহিনীর তেজ। একবার দুটি মেয়ের প্রতি সৈন্যদের অত্যাচারে ফুঁসে উঠেছিলেন—"এমন কি কেউ ছিল না, যারা দুটো থাপ্পড় মেরে ওদের উদ্ধার করতে পারে।"

রামকৃষ্ণদেবকে মানি না মানি মিশনে দীক্ষা নেওয়াটা আজকাল উচ্চবর্গীয়দের একটা হুজুগে বা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুর গুরুবিলাসী বা বিলাসিনীদের বা ফ্যাসনিস্টদের এক ধরনের বর্ম বিলাসে পরিণত হয়েছেন। হায় ঠাকুর!

ইংরাজ বিদ্বেষী না হলেও ঠাকুর চাটুকারদের পছন্দ করতেন না। একবার এক ঐ শ্রেণীর লোক গীতার সুখ্যাতি করায় ঠাকুর হেসে বলেন—"হ্যাঁরে, কোন ইংরেজ বোধহয় গীতার সুখ্যাতি করেছে?" তিনি নিজ পোষাক নিয়ে খুবই সচেতন ও ফিটফাট ছিলেন। কোথাও যাবার আগে শিষ্যদের দেখিয়ে নিতেন। যা স্বামীজীও ছিলেন। শুধু নিজে নন মহেন্দ্র দত্তকে বলেছিলেন পোষাক নিয়ে সচেতন হতে। খাদ্যাখাদ্য বা আমিষ নিরামিষ নিয়ে তাঁর বাড়াবাড়ি ছিল। স্বামীজিরও খাদ্য নিয়ে খুঁতখুঁতানি ছিল না। প্রভু নিত্যানন্দেরও খাদ্য নিয়ে বাছবিচার ছিল না।

অদ্বৈত স্বামী যেখানে সেখানে যাওয়া বা যা তা খাওয়া নিয়ে নিত্যানন্দকে ভর্ৎসনাও করেন, "নিতাই যেথায় সেথায় যায়, যা তা খায়।"

শ্রীচৈতন্যর পরিবারের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। তাঁর ঠাকুমা শচীমাকে অনুরোধ করেছিলেন নাতিকে একবার তাঁকে দেখাতে। শ্রীচৈতন্য মাতৃ আদেশে সন্ন্যাস নেবার পরও শ্রীহট্টে গিয়ে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর একটি নিজের ও একটি শ্রীকৃষ্ণর মূর্তি দিয়ে নাম জপ করতে করতে বলেন, সন্ন্যাসী হলেও তাঁর মাতৃভক্তিতে

খামতি ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীও অতি মাত্রায় মাতৃভক্ত ছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন সাহসী সমাজকর্মী ছিলেন। চূয়া ও চন্দনের বিবাহ তাঁর সেই সাহসিকতারই প্রমাণ। এছাড়া তিনি একজন দক্ষ লাঠিয়াল ও সাঁতারু ছিলেন। তিনি যখন লাঠি ঘোরাতেন সে সময় ঢিল ছুঁড়লে ছিটকে ফিরে আসত। পুরীর সমুদ্রে ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে সাঁতার কেটেছেন। প্রয়োজনে তাঁকে লাঠিবাজি করতেও দেখা গেছে বলে তাঁর জীবনী গ্রন্থে লেখা আছে। কাজীর প্রতি রুষ্ট হয়ে তিনি তার ঘর ভেঙে অগ্নি সংযোগ করতে বলেন। আজ আমরা যে সভা-সমিতি, বাতি মিছিল ইত্যাদি করি, ৫০০ বৎসর পূর্বে চৈতন্যদেবই সে সবের সূত্রপাত করে গেছেন। অথচ তাঁর ভক্তিবাদ-ভাবকে প্রাধান্য দানের ফলে অপর দিকগুলি বাদ পড়ে গেছে। রাধা ভাবের আড়ালে তার বিদ্রোহী ভাব চাপা পড়ে গেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মতে এতে বাঙালির রাজনৈতিক ক্ষতি ও বীর্যভাব এর ক্ষতি হয়েছে। উড়িষ্যার অনেকেও এই মত পোষণ করেন। অনেকে তাঁর দ্বারা উড়িষ্যার ক্ষতির কথাও বলেন। অবশ্য তিনি মূলত ছিলেন একজন সংস্কার ও সমাজকর্মী।

ঠাকুর আমাকে তাঁর পুজোপাঠ প্রার্থনা করতে কখনো তো উপদেশ দেননি—ঠাকুরের প্রধান শিক্ষা অনন্ত মত, অনন্ত পথ, কোথাও সঙ্কীর্ণতার জায়গা নেই। আমি সেই আদর্শে দীক্ষিত। স্বামীজি ঠাকুরের মূর্তি গড়ে পূজার পক্ষে ছিলেন না।

শ্রীচৈতন্য নিজে অধিক কিছু রচনা না করেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি হয়ে আছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যত কাব্য-সঙ্গীত-প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে যা খুব কমই দেখা যায়। বাঙালির নিজ সঙ্গীতের অভাব পূরণ করেছিল কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গের গান। এই গানের সঙ্গে হত/হয় এক বিশেষ ধরনের নৃত্য। বিশ্বের কোণে কোণে আজ তাঁর ধর্মমত প্রচারিত। একদিকে তাঁর ভক্তিবাদী ভাববাদী সত্তা, একই দেহে দুই রূপ তাকে ৫০০ বৎসরেরও অধিক কাল বাঙালির মন জগতে অমর করে রেখেছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, ধর্মের মধ্যে বিভেদ দূর, ভেদাভেদ দূর তাঁর মহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

আজ শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণ মনুষ্যত্বের চরম ও পরমতম স্তরে পৌঁছে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। এঁদের ভক্তিবাদী দিকটির সঙ্গে সংস্কার ও বিপ্লববাদী দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচনার যোগ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে ভক্তিবাদই প্রধান। ভক্তরা তাঁকে